Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 34-44
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ : একটি বিশ্লেষনী পাঠ

মধুসূদন সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাড়, আসাম

Abstract

Prafulla roy, one of the best fiction writer of bengali leterature in twenty century. His fris short story focuses on the partition of country. The frist short story he wrote was 'manjhi .By the end of the partition, Prafulla roy was forced to leave upper bengal an settle in kolkata. The post-partition life experience has emarged in the literature. Not only did he the restrict the partition of bengal, in the context of whole of India, he portrayed the heartbreaking evevnt country side. Prafulla roy is one of the exceptional fiction writer in composing the country division. His literary talent is reflected in the short stories of the division of country. I Will try to review some of the selected stories in that research paper.

এমন সোনার বাংলাদেশে
মানুষ বেড়ায় ভেসে ভেসে
হলাম বাস্তুহারা সর্বহারা --
কার কলমের খোঁচায়।

(সুরেন্দ্রনাথ সরকার)

হ্যাঁ রাস্ট্র নেতাদের কূটনৈতিক কলমের খোঁচায় ভারতবর্ষ দ্বি-খন্ডিত হয়। স্বাধীনতা ও দেশভাগ সমার্থক দুটি শব্দ। বিংশ শতাব্দীর বাঙালির সমাজ জীবনে কলঙ্কিত ঘটনা দেশ বিভাজন। দেশভাগের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বাংলার সমাজ জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল।

আমরা নব প্রজন্ম সোনার বাংলার উদার আকাশের অংশীদার হতে পারিনি, পারিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চোখে দেখা বাংলার ছায়া সুশীতল শান্ত রূপটি দেখতে। এর একটাই কারণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলস্বরূপ দেশভাগ যা এই উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। যার ক্ষতের দাগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে চলছে।।আমাদের অর্জিত যে স্বাধীনতা তার মানে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। আবার আমাদের যে স্বাধীনতা দিবস তা মুক্তির দিনের এর পাশাপাশি আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গের জন্মদিনও বটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাধী শক্তি ভারতে দুশো বছরের অত্যাচারের অবসান তথা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এমত অবস্থায় ভারতীয় রাষ্ট্রনেতারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলেন না। মুসলিম লীগের যে দাবি ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার তা মানতে নারাজ ভারতীয় রাষ্ট্রনেতারা এই ঘটনায় মুসলিম লীগের নেতারা কিছুটা হতাশ হয়েই ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট একশন ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। সারা ভারতবর্ষে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,লুন্ঠন,ধর্ষণ। এই দাঙ্গার অনিবার্য পরিণতি দেশভাগ। বিংশ শতাব্দীর কলঙ্কিত

ঘটনা দেশভাগ যেমন বাঙালির আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি বাঙালির শিল্প সাহিত্যও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

দেশভাগের মত এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে দুই বাংলায় রচিত হয়েছে অজস্র গল্প উপন্যাস। পশ্চিম পারের কথাকারদের মধ্যে রয়েছে খুশবন্ত সিং,অমৃতা প্রীতম,সাদাত হোসেন মান্টো,আবার পূর্ব সীমান্তের কথা উঠে এসেছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,সমরেশ বসু প্রমূখ কথাকারদের রচনায়। তবে দেশভাগের এই মহা বিপর্যয়ের কাহিনী কে যিনি যথাযথ ভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয়েছে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাকার প্রফুল্ল রায়। বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী তথা ভুক্তভোগী প্রফুল্ল রায় দেশভাগ- পরবর্তী সময়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে বাংলার পাশাপাশি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন, ছিন্নমূল মানুষদের সংস্পর্শে এসেছেন -- যা তাঁর সাহিত্যে নিরুপেক্ষ দৃষ্টি কোনে উঠে এসেছে।

একটি সাক্ষাৎকারে প্রফুল্ল রায় জানিয়েছেন--'নারায়ণদা পূর্ব বাংলার মানুষ। তাঁর দু'চারটি ছোট গল্প এবং উপন্যাসে দেশভাগের কিছু চিত্র অবশ্যই আছে। তাঁকে বড় আকারের এই একটি উপন্যাস লেখার আর্জি জানিয়েছিলাম। নারায়ণদা বলেছেন - অনেক কাল আগে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। পূর্ব বাংলা তাঁর স্মৃতিতে যতটা আছে, অনুভূতিতে ততটা নেই। তিনি বরং আমাকে এ বিষয়ে লিখতে বলেন। কেননা দেশভাগের কারনে জন্মভূমি থেকে আমাকে উৎখাত হয়ে চলে আসতে হয়। দেশ হারানোর সেই যন্ত্রনা আমি চিরকাল ভোগ করে চলছি।'[১]

গল্পকার প্রফুল্ল রায়ের অনুভূতি ও স্মৃতি উভয় ক্ষেত্রেই দেশভাগ জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যার কারণেই এমন হৃদয় বিদারক ঘটনাকে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

আমার এই আলোচনা পত্রে গল্পকার প্রফুল্ল রায়ের গল্পে দেশভাগের প্রতিচ্ছবি কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্পে দেখানোর চেষ্টা করব। দেশভাগ কে কেন্দ্র করে তার অন্যতম মহাকাব্যিক উপন্যাস কেয়া পাতার নৌকা ও ১৭ টি ছোট গল্প রচিত হয়েছে। দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্প গুলি হল'মাঝি','চর','রাজা যায় রাজা আসে','ধুনীলালের দুই সঙ্গী','স্বপ্নের ট্রেন', 'শেকড়', 'কাছেই আছে', 'বিদেশি' যেখানে সীমান্ত নেই' চিকন' চিকন্দিপুর','অলীক নৌকার যাত্রী''জনক','রক্তকমল'দেশ নেই','অনুপ্রবেশ'স্বাদ'এবং একটি 'একটি শব্দের মানে'। এর মধ্যে তারঁ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই যে গল্পটির কথা উল্লেখ করব সেই গল্পটি হল 'মাঝি'। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার সন্ধিক্ষণে'মাঝি' গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেশভাগের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল রায় দেশ জাতির কাছে ঐতিহাসিক দায়িত্বও পালন করেছেন। রাজনীতির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি দেশভাগের আসল সত্যটি উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'মাঝি' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ফজল। ফজল ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা চালায়। তার জীবিকা চলে কেয়ারা চালিয়ে। যুবক বয়স, দেহ মনে উত্তাল হাওয়া বইছে। তার স্বপ্ন সুন্দরীর নাম সলিমা। সলিমাকে ঘিরেই তার যাবতীয় স্বপ্ন। ফজল মাঝি সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সলিমার বাবার চোখের আড়ালে সেই স্বপ্নই জাল বুনে তারা দুজন। মা মরা ষোড়শবর্ষী মেয়েটি বাবার কড়া শাসন টপকে ফজল মাঝির সঙ্গে দেখা করে। সলিমার আসতে দেরি হলে ফজল মাঝি অভিমান করে। ফজল মাঝি সলিমার প্রেমে বিভোর। তার ছোট ঘরে সলিমাকে নিয়ে সংসার করার কল্পনা করে। সেই আশায় বুক বাঁধে প্রেমিক ফজল। কিন্তু সলিমা যখন জানায় প্রতিদিনই পাত্ররা তার বাজানের কাছে আসেন। আর বেশি দিন সে এভাবে থাকতে পারবে না।

স্বপ্ন সুন্দরী সলিমার হৃদয়ে আশা জাগিয়ে ফজল কেয়ারার উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। তিল তিল করে টাকা জমিয়ে ফজল সলিমাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যাবে। কন্যাপণের সমস্ত টাকা সলিমার বাপজানকে দিয়ে তবেই সে

সলিমাকে আপন করে পাবে। কারণ সলিমার পিতা টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। সে সময়ের সামাজিক বিবাহ রীতিতে ছেলেকে কন্যাপণ দিয়েই বিবাহ করতে হত, সেই বিষয়টিও গল্পে উঠে আসে। ফজল, সলিমার বাপজানকে ব্যঙ্গ করে বলেন—

"তোর বাজানে যে চামার, সাত কুড়ি টাকা নিব গইন্যা গইন্যা (গুনে গুনে) হেয়ার পর মাইয়া দিব।" [২]

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের'রস' গল্পের কাহিনি।'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পেও দেখি গুড় ব্যাপারী মোতালেফের দ্বিতীয় স্ত্রী ফুলবানুকে পেতে ফুলবানুর পিতা এলেম খানকে কন্যাপণের টাকা দিতে হয়। বহু কষ্টের উপার্জিত টাকা দিয়ে মোতালেফ ফুলবানুকে বিয়ে করে। ফজলও সলিমাকে পেতে দিনরাত কষ্ট করে যাচ্ছিল।

চারিদিকে দেশত্যাগের হিড়িক। দলে দলে হিন্দুরা এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় যাচ্ছে। কেয়ারা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারাপাশা স্টিমার ঘাটের দিকে নৌকা ভাসায় ফজল। পূর্বে সঞ্চিত টাকার সঙ্গে আর মাত্র দশ টাকা যোগ করলেই সলিমাকে বিয়ে করে ঘরে আনতে পারবে। নৌকা ভাসিয়ে ফজল মনের সুখে গান ধরে—

"কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উন্মন,
আর খাইয়াছি আমার বধূর
পেরথম যৈবণ।" [৩]

তারাপাশার স্টিমার ঘাটে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে পূর্বের কথামতো নারকেল বনে সলিমার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসানোর উপক্রম হতেই কেয়ারা চেয়ে হাঁক আসে। লোকটি কাছে আসতে ফজল মাঝি তাকে চিনে নেয়। পাশের গ্রাম মালখানরের ইয়াছিন শিকদার। তার সঙ্গে বোরখা পরিহিত একজন মহিলা। ফজল ভেবে নেয় সম্ভবত ইয়াছিনের বিবিজান।

ইয়াছিন চর ইসমাইল যেতে চায়, কিন্তু ফজল এই সন্ধ্যায় চর ইসমাইল যেতে রাজি হয় না। দিনের গতিক ভালো নয়, এই বলে আপত্তি জানায়। কিন্তু ইয়াছিন শিকদার তাকে অতিরিক্ত টাকার কথা বলে। অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ যখন দশ টাকা হয় তখন ফজল না করতে পারে না। এই উত্তাল পরিস্থিতিতেও সে রাজি হয়ে যায় চরইসমাইল যেতে। এই অদম্য সাহস ও পরিশ্রমী মনোভাব ফজলের প্রেমধর্ম পালনে গতি দান করে। সলিমার অসহায় আর্তি মনে পড়ে তার তাকে কত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিয়ে আসবে সেই কথা পালনেই ফজল মাঝি বদ্ধপরিকর।

ইয়াছিন শিকদারের সঙ্গে কেয়ারা ভাড়া পাকাপাকি করে ফজল। নৌকায় উঠতে বলে তাদের। ইয়াছিন নৌকায় উঠলেও বোরখা পরিহিত মহিলাটি উঠতে নারাজ। তখন থেকেই ফজলের মনে কিছু একটা সন্দেহের দানা বাঁধে। মেয়েটি অসম্মতি জানিয়ে বলে —

"না না আমি যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান আপনের পায়ে পড়ি।" [৪]

কিন্তু ইয়াছিন তার কথা কোন মতেই শুনতে চায় না। গর্জন করে বলে উঠে—

"হারামজাদী সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাঞ্জাখাঁর নাতনির লাখান নাইলে শুয়াখোর ওই কেরামত ডাকুই তরে নিয়া যাইত। তার কিল খাওয়ার থিকা আমার খোদ বেগম হওয়া কি ভাল না।" [৫]

ইয়াছিনের এহেন আচরণ ফজলের মোটেই ভালো লাগে না। কারণ সহজ-সরল ফজল মাঝি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনো হয়নি। যে ইয়াছিনকে কাল সকালে যাবার কথা বলে। কিন্তু ইয়াছিন তাকে মোট পনের টাকা দিতে চায়। ফজলের যাবতীয় অতিরিক্ত কষ্ট শুধুমাত্র সলিমাকে নিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ ফজল মাঝি, নৌকার ভিতর ধস্তাধস্তির আভাস পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইয়াছিনকে উদ্দেশ্য করে মেয়েটি বলে —

"হয় আমারে মাইরা ফালান। নাইলে ছাইড়া দ্যান। নাইলে আমি জলে ঝাপ দিমু।" [৬]

কিন্তু ইয়াছিন শিকদার তার কোনো কথাই শুনতে চায় না। মেয়েটির প্রত্যুত্তরে ইয়াছিন মেয়েটিকে যা বলে, তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইয়াছিনের মানসিকতা কতটা কদর্য হলে এরূপ উক্তি করতে পারে। সে বলে—

"পুরান স্বামীতে কতদিন আর হোয়াদ (স্বাদ) থাকে? নয়া হোয়ামী লইয়া অহন ঘর করবি। মন মেজাজ তাজা অইব।" [৭]

ইয়াছিন শিকদারের কথাগুলির মধ্যে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা বিধ্বস্ত সমাজ জীবনে নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্রটি পরিস্ফুট হয়। সমগ্র বাংলা জুড়ে দাঙ্গা পরবর্তী মানুষে-মানুষে যে বিশ্বাসহীনতা ও হানাহানি দেখা দিয়েছিল এই গল্পের কাহিনিতে তাই উঠে আসে।

নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে মেয়েটি, ফজল মাঝির আশ্রয় নেয়। ফজলও মেয়েটির পাশে দাঁড়ায়। ফজল সামান্য মাঝির জীবনযাপনে অভ্যস্থ, কিন্তু অস্থির সময়েও নিজের মানবিকতার বিসর্জন দেয়নি। মেয়েটির করুণ আর্তি ফজলকে আরও মানবিক করে তুলে। মেয়েটি ফজলকে জানায় —

"আমারে বাঁচাও মাঝি, আমারে বাঁচাও। আমি তাঁতি বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে ওরা।" [৮]

মেয়েটির এই করুণ আর্তি ফজলের শিরায়-শিরায় একটি প্রতিবাদের ঢেউ বয়ে যায়। ফজলের হাতের কোঁচটা তৎক্ষণাৎ ইয়াছিনের বুক চিরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর নৌকার ভার কিছুটা কমে যায়। ফজল রক্তাক্ত কোঁচাটা ভালো করে ধুয়ে নৌকায় রেখে দেয়।

প্রেমিক ফজল গল্পের শেষাংশে হত্যাকারী ফজলে পরিণত হয়। ফজলের প্রেম ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে বিশ্বজনীন রূপ নেয়। নারীর প্রতি প্রেম ব্যক্তিগত সীমানা অতিক্রম করে যথার্থ প্রেম নারীর ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষাকারী মানবিক সত্ত্বাতে পৌঁছেছে ফজল মাঝির প্রেম। ইয়াছিনদের মতো ইবলিশদের হত্যা করা মানে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা আর এই প্রেক্ষিতে তাঁতি বউ আর সলিমা তার কাছে সমান্তরালভাবে ধরা পড়েছে। তাঁতি বউ এর সম্মান রক্ষা করা মানে জগতের সকল নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকর্তা রূপে নিজেকে প্রমাণ করা। তাঁতি বউ এর আর্তনাদ তাকে পীড়া দেয়। গল্পে দেখা যায়—

"ইয়াছিন আর সেই নারী মূর্তির কথোপকথন খ্যাপা তুফানের মতো ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ফজলের হৃদপিণ্ডে।" [৯]

ইয়াছিনকে হত্যা করে ফজল মাঝির খুনি সত্ত্বাকে ছাপিয়ে গেছে ইজ্জত রক্ষাকারী সত্ত্বা আর এখানেই প্রেমিক সত্ত্বার জয় ঘোষিত হয়েছে।

ইয়াসিনের হত্যার পর ফজল মাঝি মেয়েটির কাছে তার পূর্বের কথা জানতে পাড়ে। দাঙ্গা তার পরিবার পরিজন থেকে তাকে আলাদা করেছে। দাঙ্গাকারীরা তার স্বামীকে হত্যা করেছে। সেই সময়ের দাঙ্গায় তাঁতি বউ-এর মতো হাজার হাজার নারীর পরিণতিও এইরূপ হয়েছিল— সেই চিত্র উঠে আসে আলোচ্য'মাঝি' গল্পে। মেয়েটি ফজল

মাঝিকে অনুরোধ জানায় কলকাতার স্টিমারে তাকে উঠিয়ে দিতে। কারণ তার একমাত্র আত্মীয় কলকাতাতেই রয়েছে। ফজলও তার কথামতো কলকাতার স্টিমারের টিকিট কেটে দেয়। মেয়েটির কাছে কোনো টাকা পয়সা না থাকায় ফজলের বহু কষ্টের অর্জিত টাকা যা সলিমার জন্য জমিয়ে রেখেছে তা দিয়েই মেয়েটির টিকিট কেটে দেয়। আরও কিছু টাকা মেয়েটিকে দেয়।

ফজল মাঝির এইরূপ আত্মত্যাগও মানবতাবোধ গল্পটিকে বিশ্বজনীন করে তুলেছে। নিজের ভালোবাসাকে ঘরে আনতে তার দিনরাত পরিশ্রম। তিল তিল করে টাকা জমানো কিন্তু অসহায় তাঁতি বউকে সহায়তা করতে একবারও ফজল পিছু হটে না।

ফজলের মতো এমন অনেক প্রান্তিক মানুষদের মানবতাবোধ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ধরা পড়ে প্রফুল্ল রায়ের গল্পে। ফজল মাঝি তারই বাস্তব দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর যে ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষুধা নিবারণের জন্য লড়াই করে জাতিগত ও ধর্মগত বৈষম্য থেকে নিজের মুক্তি ঘটাতে হাঁপিয়ে ওঠে, যে ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষদের এমন মহানুভবতা প্রফুল্ল রায়কে ভাবিয়ে তুলে আর এই ভাবনা থেকেই তাঁর গল্পের কাহিনি নির্মিত হয়। গল্পকার প্রফুল্ল রায় তাঁর সাহিত্য ভাবনা সম্পর্কে বলেছেন —

> *"দেশজোড়া বৈষম্য, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য এবং গভীর তামাশার মধ্যে মানুষকে আমি তার স্বমহিমায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। এত ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যেখানে মনুষ্যত্বের এতটুকু স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়েছে আমার লেখায় তা ধরতে চেয়েছি। কেননা মানবিকতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া কোন দেশ বাঁচতে পারে না।"* [১০]

তাঁতি বউকে কলকাতার স্টিমারে উঠিয়ে দিয়ে কেয়ারা ঘাটে নিজের মল্লাই নৌকাটার দিকে আসতে আসতে ফজলের একবারও সলিমা অথবা তাঁতি বউ-এর কথা মনে পড়েনি। ফজলের শুধুমাত্র মনে পড়েছে সেই রক্তাক্ত কোঁচের ফলাকার কথা। সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে না জানি আরও কতবার ইয়াছিনদের মতো ইবলিশদের আগমন ঘটবে তার নৌকায়।

'মাঝি' গল্পের সমাপ্তি ফজল মাঝির স্বপ্নভঙ্গ ও ইয়াছিনদের মতো আর শত শত ইবলিশদের ধলেশ্বরীর বুক মিটিয়ে দেবার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে। প্রফুল্ল রায় এক ঐতিহাসিক সত্যের বাস্তব দিকটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। দাঙ্গা ও দেশভাগ পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা যে শুধুমাত্র লুঠবাজ ও হত্যাকারি-ই ছিল না, ওপার বাংলার বহু হিন্দু উদবাস্তু অসহায় মানুষদের রক্ষাকর্তাও ছিল, 'মাঝি' গল্পের ফজল চরিত্রটির মধ্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এইদিক থেকে গল্পকার প্রফুল্ল রায় দেশভাগ কেন্দ্রিক অন্যান্য রচনাকার থেকে স্বতন্ত্র ভিন্ন ধারার পথিক। ফজল এই গল্পে সৎ মানুষের প্রতিনিধি। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও মানবতার প্রতীক হয়ে'মাঝি' গল্পে চিত্রিত হয়েছে যা গল্পকার অতি দক্ষতায় তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

প্রফুল্ল রায় দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্প রচনায় এক দক্ষ রূপকার। তাঁর দেশভাগ কেন্দ্রিক অপর একটি ছোট গল্প'রাজা যায় রাজা আসে' আমরা এই গল্পে দেশভাগের ভিন্ন চিত্র লক্ষ্ম করি। দেশভাগ শুধুমাত্র যে ধ্বংসের ছবি তেমনটা নয়, গল্পে দেশভাগ দুই বাংলার কিছু মানুষের জীবনে স্বপ্নের মতো ছিল। কিছু মানুষের আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটাতেও দেশভাগ প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছিল। তবে কেউ স্থায়ী ভাবে লাভবান হয়েছিল আবার কেউ ক্ষণিকের জন্য সে লাভ করেছিল ভোগ। দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় এবং ওপার বাংলা থেকে প্রচুর মানুষ এপার বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এই সব মানুষের জীবনচক্রে একই সঙ্গে যেমন সুখ ছিল তেমনি তেমনি দুঃখও ছিল। কেউ নিজ ভিটে মাটি হারিয়ে অপরের পরিত্যক্ত ভিটে মাটি পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে আবার কেউ দেশভাগের পরবর্তীতে বিনিময় প্রথায় পুনর্বার সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে দাঁড়িয়েছেন।'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পটি তেমনি একটি আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে।

দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দুরা এপার বাঙলায় চলে আসতে লাগে তেমনই একটি হিন্দু পরিবার বৈকুণ্ঠ সাহার পরিবার। তারা দেশভাগের আগে ছিপতিপুর গ্রামেরই অভাবী সহজ- সরল রাজেককে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে আসেন। যাবার সময় বৈকুণ্ঠ সাহা বলে যান তারা যদি ফিরে আসে তবে রাজেক যেন তাদের বিপুল ভিটেমাটি ও নব্বুই কানি জমি ফিরিয়ে দেন। আর যদি না আসেন তবে সব সম্পত্তির মালিক রাজেক। এর পর থেকেই হাড়- হাভাতে অসহায় দরিদ্র রাজেকের জীবন আমূল পরিবর্তন আসে। গল্পকার বলেছেন—

> *"এতগুলো বড় বড় টিনের ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, পুকুরের পর এক লপ্তে নব্বুই কানি দো ফসলা জমি- সমস্ত মিলিয়ে রাজা বাদশার ঐশ্বর্য। আর এ সবই এখন রাজেকের।"* [১১]

হ্যাঁ দেশভাগ হত-দরিদ্র রাজেকের জীবনে রূপকথার মতোই এসেছে। কিছুদিন আগেও যে রাজেক কে গ্রামের সকলে'আরে আহাম্মক' বলে সম্বোধন করত সেই রাজেক এখন সকলের কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি দেশভাগের গল্প রচনার প্রফুল্ল রায় ব্যতিক্রমী এক কথাশিল্পী। দেশভাগ কেন্দ্রিক খুন, লুঠপাট, ধর্ষণ শুধুমাত্র তাঁর গল্পে স্থান পায়নি, তার সঙ্গে ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণার পাশাপাশি ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার চিত্রও চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে। মানুষে-মানুষে যে বিশ্বাসহীনতা দেখা দিয়েছিল রাজেকের মধ্যে সেই বিশ্বাস স্থাপনেই ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। পরম যত্নে বিগত আট মাস বৈকুণ্ঠ সাহার সম্পত্তি রক্ষা করে এসেছে রাজেক।

বৈকুণ্ঠ সাহার কথাতেও আমরা সেই আভাস পাই। মনিব বৈকুণ্ঠ সাহা আমিন সাহেবকে রাজেক সম্পর্কে বলেছেন—

> *"আর ও হইল রাজেক মেঞা, বড় বিশ্বাসী মানুষ, আমরা যখন দ্যাশ ছাইরা যাই তার উপর বাড়ি ঘর জমিজিরাতের ভার দিয়া গেছিলাম। দ্যাখেন কেমন সোন্দর পরি (পাহারা) দিয়া রাখছে।"* [১২]

হিন্দু মনিবের সহায় রক্ষা করে রাজেক যে বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তা রাজেকর মতো প্রান্তিক মানুষের মহানুভবতাই প্রমাণ করে। মুসলমানরা যে শুধুমাত্র হিন্দু সম্পত্তির হরণকারীই ছিল না রাজেকের মতো রক্ষাকারীও ছিল- সেই সত্যটিও উঠে এসেছে। চারিদিকে বিশ্বাসহীনতার মাঝেও রাজেকের এই সততা গল্পটিকে বাস্তব সত্য উত্তীর্ণ করে তোলে।

দরিদ্র রাজেকের বৈকুণ্ঠবাবুর বিপুল সম্পত্তি পাওয়ার পরেই তার আশেপাশে একদল লোভী লোকের আনাগোনা বেড়ে যায়। এমনই একদিন গ্রামের সর্বপেক্ষা ধনী, ধূর্ত তোরাব আলি রাজেকের বাড়িতে উপস্থিত হয়। রাজেক তার এই আগমনে কিছু মতলবের আভাস পায়। নানা কথাবার্তার পর তোরাব আলি বৈকুণ্ঠ সাহার খবর জানতে চায়। তাদের এ দেশে আসার সম্ভাবনাও সে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। তোরার আলি আর রাজেকের কথোপকথনে দেখা যায়—

> *"বৈকুণ্ঠ সা'রা আর ফিরব?*
> *কেমনে কমু?*
> *রাজেকের কথা যেন শুনতে পেল না তোরাব আলি। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, আমার মনে লয় অরা ফিরব না।"* [১৩]

দেশভাগের মহাবিপর্যয় ও একদল মানুষ অভাব এর মাঝেও নিজ সততা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি অঁটুট থেকেছে আবার তোরাব আলির মত কিছু মানুষ নিজের আখের গোছাতেই সদা ব্যস্ত থেকেছেন। এই বাস্তবিক চিত্রই আমরা এই গল্পে দেখতে পাই।

রাজেক এখন প্রচুর সম্পদের মালিক। বৈকুণ্ঠ সাহা পরিবারও এদেশে আর আসবে না ভেবে তোরাব আলি রাজেককে নানাভাবে আদর-আপ্যায়নে ভরিয়ে তোলে। আট মাস আগেও যে রাজেক ভালো করে দুবেলা খেতে পারতো না, দেশভাগ যেন তার জীবনে আলাদিনের প্রদীপের মতো জীবনকে সুখ ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেয়। রাজেকের খাবারের আয়োজন প্রসঙ্গে গল্পকার বলেছেন —

> *"খাবার ব্যবস্থা ভেতর বাড়িতে। তোরার আলি আয়োজনও করেছে পাঁচ-ছ রকমের মাছ, মাংস, পায়েশ, পাতক্ষীর, বড় বড় মোহন বাঁশি কলা, পরু সরওলা হলুদবর্ণ ঘন দুধ।"* [১৪]

তোরাব আলির যাবতীয় আয়োজনের উদ্দেশ্য নিজের কন্যার সঙ্গে রাজেকের বিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠ সাহার সমস্ত সম্পত্তির অংশীদার হওয়া। সে উদ্দেশ্যেই রাজেকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে। রাজেককে সে কথা জানিয়েও দেয় তোরাব আলি। সে জানায় আগামী শনিবার তার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, সে যেন তৈরি হয়ে থাকে। তোরাব আলির নৌকায় তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু শেষে দেখা যায় ঘাটে নৌকা আসে ঠিকই কিন্তু সে নৌকা তোরাব আলির নয়। দীর্ঘ আট মাস আগের এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় চলে যাওয়া বৈকণ্ঠ সাহা ও এক বর্ষীয়ান আমিন সাহেবকে নিয়ে ঘাটে নামেন। রাজেকের মনটা হঠাৎ দুলে ওঠে। রাজেক তাদের বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাতে লাগে। বৈকুণ্ঠ সাহা জানায় মুর্শিদাবাদের আমিন সাহেব এপার বাংলা চলে আসতে চান। তাই তার সম্পত্তির সঙ্গে বৈকুণ্ঠ বাবুর সমস্ত সম্পত্তি বিনিময় করবেন। এ কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রাজেক। তোরার আলীর নৌকাও ঘাটে অপেক্ষা করে। তাদের ফিরিয়ে দিতে চাইলেও রাজেক শেষ পর্যন্ত পারেনি। তোরার আলির বাড়িতে গিয়ে বিয়ের আনন্দের মাঝেও মন খারাপ করে বসে থাকে সে। সন্দেহ হয় তোরার আলির রাজেকের কাছে শুনতে পায় বৈকুণ্ঠ সাহা তার সমস্ত সম্পত্তি আমিন সাহেবের সঙ্গে বিনিময় করবেন। একথা শুনামাত্র তোরাব আলি বিয়ে বন্ধ করে দেয়। কিছু সময় একা থাকার পর রাজেক বেরিয়ে পড়েন আবার আগের জীবনে।

'রাজা যায় রাজা আসে' এ গল্পে প্রফুল্ল রায় এক চিরন্তন বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন। দেশ ভাগ কারও কারও জীবনের রূপকথার মতো সৌভাগ্য সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, তেমনি কারও কারও জীবন ভাগ্য বিপর্যের শিকার করে তুলেছিল। যে রাজেক জন্ম থেকেই কষ্টের জীবন অতিবাহিত করেছে, দেশভাগ তার জীবনে রূপকথার মতো ছিল। কিন্তু সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সেই কষ্টের জীবনেই ফিরে যেতে বাধ্য হয় সে। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায় রাজেক। আলাদিনের প্রদীপের স্পর্শে তার জীবনে রূপকথা সৃজিত হয়েছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়। সে হতদরিদ্র রাজেকই থেকে যায়। গল্পের শেষে রাজকের উক্তি গল্পটিকে অন্যমাত্রা দেয়—

> *"দ্যাশখান দু-ভাগ হয়, সাহারা- ভুইমালীরা-যুগীরা গ্রাম ছাইড়া যায়, দ্যাশের এক রাজা যায়, আরেক রাজা আসে, তাতে তর কী রে, তর কী?"* [১৫]

এই উক্তি আসলে রাজেকের মত শতশত প্রান্তিক মানুষদের। যাদের জীবন দেশভাগের ফলে যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থেকে যায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাদের জীবনকে পাল্টে দিতে পারে না। এই বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গল্পকার'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পের কাহিনি নির্মাণ করেছেন।

দেশভাগ কেন্দ্রিক অপর একটি গল্প'চর'। এই গল্প আমরা লক্ষ করি একটি সম্প্রদায় যে অন্য একটি সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র হত্যাকারীই নয় তারা যে রক্ষাকারীও তার চিত্র। তিনি শুধুমাত্র একপেশে ঘটনার বিবরণ দেননি তাঁর দেশভাগ কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে। দেশভাগের প্রকৃত স্বরূপ তিনি উদঘাটন করেছে উভয় সম্প্রদায়ের ভাল-মন্দের নিরিখে। আর এখানেই প্রফুল্ল রায়ের গল্পের সার্থকতা 'মাঝি' গল্পের খলচরিত্র ইয়াছিনের মতো 'চর' গল্পে আমরা ছদন শিকদারকে দেখতে পাই। সে একজন লম্পট দুঃশ্চরিত্র অর্থলোভী মানুষ। দাঙ্গা ছদনের লাম্পট্য কে আরো বেশি করে উৎসাহিত করে। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু তাঁতি বাড়ির বিধবা বউকে ভোগ করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে। এবং দীর্ঘ এক বছর সময় ধরে তাকে রক্ষিতার মতো ভোগ করে।একসময় সুখী সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে।

ছদন শিকদারের আর তাকে রক্ষিতা হিসেবে রাখতে চায় না। সে হত্যার চক্রান্ত করে, তার পরিচিত দুই মাঝি হালিম ও তামিজ কে দায়িত্ব দেয়। মেয়েটিকে হত্যা করার কিন্তু প্রান্তিক দারিদ্র্য এই মানুষ দুটি টাকার বিনিময় সুখী কে মারার দায়িত্ব নিলেও তাকে তারা হত্যা করতে পারেনি। সুখীকে একটি নতুন চরে রেখে তারা পালিয়ে যায়। সেই নতুন চরেই বসবাস শুরু করে সুখী এবং জন্ম দেয় একটি শিশুর। নতুন চরে অন্যান্য মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সে জীবন শুরু করে। গল্পকার বলেছেন—

> *"আজ তার পরিচয় অন্তত সেই চরের ছোট্ট পৃথিবীটা জানে, এই জনপদ সেই পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে- সে মা, সে সন্তানের জননী।"* [১৬]

এই নতুন চরের মহাজন ছিল ছদন শিকদার। একদিন খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে তার তিন স্ত্রী ও বিশ্বস্ত দুই অনুচরকে নিয়ে চরে উপস্থিত হয়। সে গরিব চাষিদের কাছে তার ধারের টাকা ও বীজ ধান আদায় করতে চায়। হঠাৎ চোখ পড়ে, কয়েক বছর আগের ভোগকারী সুখীকে ও তার ছেলে শিশুর দিকে। যাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে দিনের-পর-দিন ভোগ করেছে। সেই সুখী কে সে ভয় করতে লাগে। শিশুর জন্মের ইতিহাস যদি তার স্ত্রী জানতে পারে তবে তার সংসারের ঘোর বিপদ। সেই ভয়ে ছদন বলে কর্জের টাকা ও বীজ ধান দিতে হবে না, সব টাকা সে মাফ করে দিয়েছে। কিন্তু সুখী এতে সন্তুষ্ট হয় না। সুযোগ বুঝে ছদন এর কাছে আর পাঁচশো টাকা চায়। ছদন শিকদার তাতেও রাজি হয়ে যায়। এবার হালিম ও তমিজ যারা কিনা জমিদার ছদন শিকদারের লোক ছিল তারাও সুখীর পক্ষ নেয়। তারা মনে মনে ভাবে সুখীর শিশুটিই তাদের টাকা আদায়ের রাস্তা সহজ করে দিয়েছে। চরের অভাবী জীবনকে কিছুটা স্বচ্ছন্দ্য এনে দেয় সুখীর পিতৃ পরিচয়হীন শিশুটি। অন্য দিকে মানুষের প্রতি মমত্ববোধে সুখীকে হত্যা না করে, নতুন জীবনের দিকে নিয়ে গিয়ে মানবতার দৃষ্টান্তই স্থাপন করে। আর একটি সুন্দর সমাজের জন্য মানবতাই চিরন্তন সত্য যা এই গল্পে উঠে আসে।

দেশভাগ কেন্দ্রিক প্রফুল্ল রায়ের অন্যতম একটি গল্প'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী' পূর্বের আলোচনায় আমরা'মাঝি' 'চর' ও'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পে পূর্ব বাংলায় প্রেক্ষাপটকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী গল্পের পটভূমি ছিল ভারতবর্ষের বিহার রাজ্য। পূর্বে আলোচিত গল্পগুলোতে আমরা লক্ষ করি কিছু অসাধু মুসলিমদের দ্বারা হিন্দু নারীরা কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল এবং সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা রক্ষিতও হয়েছিল। কিন্তু এই গল্পে এক ভিন্ন চিত্র উঠে আসে। বিহারের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা কিভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল তার চিত্র ধরা পড়ে এখানে। এই গল্পে হিন্দুরা যেমন দাঙ্গা সৃষ্টিকারী হিসেবেও চিহ্নিত হয়, আবার ধুন্নিলালের মতো মানুষকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের উপকারী ও রক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপিকা সোনালি মুখোপাধ্যায় এই গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *"ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী—'মানবতার মূর্ত প্রতীক ধুন্নিলাল উনিশো ছেচল্লিশ সালে অখণ্ড ভারত জুড়ে যখন দাঙ্গা চলছিল, তখন সাদাসিধে শহর হেকমপুরায় শান্ত জীবনেও ঈষৎ উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সংখ্যায় অধিক হিন্দুরা প্রতিবেশি মুসলিমদের অন্য নজরে দেখতে শুরু করে। হেকমপুরা থেকে মাত্র বারো মাইল দূরের বারহৌলি শহরে তখন দাঙ্গা শুরু হল তখন হেকমপুরাও নিস্তেজ থাকতে পারল না। সেখানকার হিন্দুদের উত্তেজিত করার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ গৈবীনাথ মিশ্র।"* [১৭]

দেশভাগ শুধুমাত্র দুই বাংলাকেই প্রভাবিত করেনি, তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী বিহারকে প্রভাবিত করেছিল। সে সময়ের পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গৈবীনাথ, সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার গোপন ষড়যন্ত্র করে। এই পরিকল্পনা সফল করতে গৈবীনাথ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে সভা করেন। ষড়যন্ত্রকারী সেই সভায় গল্পের অন্যতম চরিত্র ধুন্নিলালকেও যেতে হয়, কারণ সে গৈবীনাথের কর্মচারী। মুনিবের কথার অবাধ্য হওয়া সমীচীন নয়। তাই তাকেও যেতে হয় সেই সভায়। ধুন্নিলাল পেশায় বন্দুকবাজ হলেও মনের

দিক দিয়ে শান্ত মানুষ। মা মরা মেয়ে এবং ব্রিটিশ অফিসার সাহেবের দেওয়া একটি ঘোড়াকে নিয়ে তার দিন কাটে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিসার তাকে তার ব্যবহার করা পুরনো বন্ধুকটিও দিয়ে গিয়েছিল।

সভায় যাবার পথে আতঙ্কিত অবস্থায় মুসলিম মহল্লায় দেখা যায় বৃদ্ধ জমিরুদ্দিন কে। দাঙ্গাকারীরা মুসলিম বস্তিতে আক্রমণ করেছে। তরুণী নাতনিকে নিয়ে অসহায় বৃদ্ধ জমিরুদ্দিন তখন ভীত। ধুন্নিলালের কাছে করুণ আর্তি জানিয়ে জমিরুদ্দিন বলে—

"ধুন্নি তুই আমার বেটা য্যায়সা। বলে দে এখন আমি কি করব? কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ধুন্নিলালের দুই হাত আঁকড়ে ধরে জমিরউদ্দিন।" [১৮]

দেশভাগ যেমন হিন্দু সম্প্রদায়কে বিধ্বস্ত করেছিল তেমনি সমানভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও নানাভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই এই যন্ত্রণার অংশীদার। আর এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রফুল্ল গল্পকে বাস্তব করে তুলেছে। গল্পে আমরা লক্ষ করি ধুন্নিলাল সেই দাঙ্গা বিধ্বস্ত জমিরুদ্দিন ও তার নাতনিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। কিন্তু যেহেতু তার বসবাস অচ্ছুৎ বস্তিতে সুতরাং সেই স্থান নিরাপদ ছিল না তাদের কাছে। এরই মাঝে ধুন্নিলাল খবর পায় বরহৌলিতে একটি রিলিফ ক্যাম্প বসেছে। তাছাড়া একশো মিলিটারিও হেকমপুরায় ঢুকেছে। চারিদিকের অস্থিরতার মধ্যে পাঁচ দিন অপেক্ষা করার পর আর উপায় ছিল না ধুন্নিলালের এমন পরিস্থিতিতে মেয়েকে রেখে যাওয়াও ঠিক হবেনা। তাই চারজনকেই একসঙ্গে যেতে হবে। ধুন্নিলালের প্রিয় সঙ্গী ঘোড়াটি ও পুরোনো বন্দুকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। সামনে দাঙ্গাবাজের দল তাকে আটকাতে চাইলে সে হুংকার দিয়ে বলে —

"বন্দুক উচিয়ে গলার শির ছিড়ে ধুন্নিলাল চেঁচায়, হোঁশিয়ার গোলি মারকে সিনা ফোড় দুঙ্গা।" [১৯]

অচ্ছুৎ নিম্নবর্গীয় মানুষের মানবিকতা প্রফুল্ল গল্পে চিরসত্য হয়ে ধরা পড়ে। এই গল্পেরও ধুন্নিলালের মধ্যে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। দেশভাগের বিপর্যয় ও বিপর্যয়ের ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটিত হয় তার এ গল্পে। তাই দেশভাগের ঐতিহাসিক ও বাস্তব রূপকারও

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত 'রক্তকমল' ছোট গল্পটি। ১৯৪৬-৪৭ এর দেশভাগের অনিবার্য পরিণতি ছিল পাকিস্তান ভাগ। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে।দেশভাগের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র সঙ্ঘাত তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা প্রতিবাদ জানায়, শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ছবি আছে 'রক্তকমল' গল্পে।এই গল্পের পেক্ষাপট নোয়াখালী এবং গল্পের নায়ক আজম।

ভাষা আন্দোলনের কথা থাকলেও এই গল্প শুরু হয়েছে দাঙ্গায়। আজমের গ্রামে তখন পালা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।মুসলিম আজম কর্ণের ভূমিকা আর অর্জুন সাজতে অমূল্য ভুইমালি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক সুস্থ নিদর্শন ছিল। ইদ্রিস মিয়া, ফারুক, রসময় নাপিত, পাশাপাশি বসে পালা দেখছিল। এমন সময় কর্ণবধের অনেক আগেই একটা শানিত বল্লমের ফলা কোথা থেকে যেন অর্জুনের বুক বিদীর্ণ করে সমস্ত আসরটাকে রক্ত স্নান করিয়ে দিয়েছে।একটা বীভৎস চিৎকারে মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল --দাঙ্গা বাঁধছে। কর্ণ বধ এর আসরে রক্তাক্ত এক নাটকের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কর্ণবেশী আজম।

প্রফুল্ল রায়ের শিকড় সন্ধানী একটি অন্যতম গল্প চিকন্দিপুর। এটি দেশভাগের গল্প যেমন আবার অসম্পূর্ণ বাল্য প্রেমের গল্প।ভারত ভাগের বহু বছর পর ২০০৮ সালে কলকাতার এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে অদ্ভুত ভাবে উঠে এসেছিল বাংলাদেশের চিকন্দিপুর গ্রাম। দুই প্রৌঢ় নরনারীর হৃদয়ে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল পূর্ববঙ্গের

অখ্যাত গ্রাম।এই আলোচনা চক্রে প্রধান ভূমিকায় থাকা তিন অধ্যাপক অমর লতিফ ,রোসানারা চৌধুরী, রনতোষ সরকার। দেশভাগের দ্বারা নানা ভাবে উৎপীড়িত ছিলেন তাঁরা।ঘটনা চক্রে রণতোষ ও রোসনারা পূর্ব পরিচিত এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।দু'জনের মধ্যে প্রেমের উদগমের সময় শুরু হয় ভারতব্যাপী দাঙ্গা এবং পরস্পর পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়ে তারা। চার দশক পরে এই এ আলোচনাচক্রের মাধ্যমে তাদের পূর্ণ মিলন হলেও রোশনারা সেই বীভৎস অতীতকে মনে করতে চাননি। রনতোসকে না চেনার অভিনয় করেন এবং আলোচনার শেষে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় একটি চিঠি দিয়ে যান রনতোসকে উদ্দ্যশ্য করে। সেখানে অবশ্য তাঁর সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। রণতোস ও রোসনারার মতো সবাই কিন্তু পুরাতন জীবনকে বিস্মৃত হতে দেননি।

শুধু বিষয় বা চরিত্র নয়, গল্পের রূপ নির্মাণেও প্রফুল্ল রায় প্রশংসার দাবি রাখেন। তাঁর প্রতিভা, সাহিত্যবোধ,দেশ-কাল সংক্রান্ত জীবন অভিজ্ঞতার আখ্যান দেশভাগের গল্পের মধ্যে যেমন রয়েছে,তেমনি এই বৃহৎ দেশের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এ ধরনের গল্পগুলিতে। তাই গল্পকার প্রফুল্ল রায় দেশভাগের গল্পে রচনায় যে মহৎ কথক-- সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায় সোনালি, 'প্রফুল্ল রায়ের ছোট গল্প এক দেশ অনেক মানুষ' করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১২।
২। রায় প্রফুল্ল'প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা- ৭৩ পৃষ্ঠা- ২৫
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮২।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮২।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা -৩৮৪।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৪।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৭।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৭।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৮।
১০। রায় প্রফুল্ল, 'সেরা ৫০ টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: ২০০৯, কলকাতা- ৭৩, পৃষ্ঠা- ৫।
১১। রায় প্রফুল্ল, 'প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা- ৭৩। পৃষ্ঠা-
১২। তদেব, পৃষ্ঠা-১২।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১২।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১৮।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪।
১৬। মুখোপাধ্যায় সোনালি, 'প্রফুল্ল রায়ের ছোট গল্প এক দেশ অনেক মানুষ' করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৬
১৭।দে অমর 'গল্পসরণি' প্রফুল্ল রায়ের বিশেষ সংখ্যা এক বিংশতিতম বর্ষ: বার্ষিক সংকলন: ২০১৭ কলকাতা - ২৮,তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৪০।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১। রায় প্রফুল্ল; 'প্রফুল্ল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'; দে'জ পাবলিশিং; নভেম্বর, ২০১৬ (দশম সংস্করণ); কলকাতা- ৭০০০৭৩।
২। রায় প্রফুল্ল; 'প্রফুল্ল রায় ৭৫ তাঁর বিপুল সৃষ্টি থেকে সুনির্বাচিত থেকে সংকলন'; করুণা প্রকাশনী; বইমেলা, ২০১০; কলকাতা- ৭০০০০৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মুখোপাধ্যায় সোনালি; 'প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প একদেশ অনেক মানুষ'; করুণা প্রকাশনী; বইমেলা, ২০১৯; কলকাতা- ৭০০০০৯।
২। সরকার তারক; 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ'; অরুণা প্রকাশন; ফেব্রুয়ারী, ২০০৯; কলকাতা- ৭০০